পাঠ্যপুস্তকের ‘শ্রমের মর্যাদা’ আর বাস্তবতার ফারাক

অনুজিৎ রায়

ছোটবেলা থেকেই আমাদের স্কুল-কলেজে ‘শ্রমের মর্যাদা’ রচনা শেখানো হয়। পরীক্ষার খাতায় আমরা শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর কথা লিখে পরীক্ষার খাতা ভরিয়ে ফেলি। কিন্তু বাস্তবে আমরা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে কতটুকু সচেতন? আমাদের চারপাশে দৃষ্টি মেললেই আমরা দেখতে পাই, পাঠ্যপুস্তকে পড়া ‘শ্রমের মর্যাদা’র সঙ্গে বাস্তবের ‘শ্রমের মর্যাদা’র সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি কেমন?

আমাদের বাংলাদেশের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বা পেশার শ্রমজীবি মানুষ বসবাস করে। উচ্চবিত্ত সমাজ ব্যবসায়ীপ্রধান। মধ্যবিত্ত সমাজে রয়েছে শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, লেখক, কেরানীসহ বিভিন্ন পেশার চাকরিজীবি মানুষ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুলত চাকরিজীবি সম্প্রদায় অধ্যুষিত। নিম্নবিত্ত সমাজে রয়েছে কৃষক, জেলে, ধোপা, শ্রমিক, কুলি, মুটে, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, ফেরীওয়ালা, মুদি দোকানদার, সবজি বিক্রেতা, হোটেল বয়, চা-পানি বিক্রেতা, ফুলবিক্রেতা, গাড়ির ড্রাইভার, বাসের কন্ট্রাক্টর, বাগানের মালি, দারোয়ান আরও অজস্র সম্প্রদায়। বিভিন্ন সমাজের বহুবিধ মানুষের সঙ্গে আচরণের প্রেক্ষিতে শ্রমের মর্যাদার বাস্তব রূপ পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় ‘তুই’, ‘তুমি’, ‘আপনি’ নামক তিনটি সম্বোধনসুচক সর্বনাম (দ্বিতীয় পুরুষ) প্রচলিত আছে। কনিষ্ঠজনরা বয়োজ্যেষ্ঠদের সাধারণত ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠজনদের সাধারণত ‘তুই’ বা ‘তুমি’ সম্বোধন করে। অবশ্য তার ব্যতিক্রমও আছে। ‘তুই’ শব্দটি দুইটি অর্থে প্রয়োগ করা হয়। একটি হলো অতি আদর বা ভালোবাসা থেকে। যেমন : পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ‘তুই’ ডেকে কথা বলেন। তারা সন্তানদের আপন করে নেওয়ার জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করেন। এছাড়া ‘তুই’ শব্দটি ব্যাকরণগত তুচ্ছার্থে বা গালি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নিচে শ্রমের মর্যাদার সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়েই আলোকপাত করব।

আমাদের মধ্যে মানুষের চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে মানুষটির সম্বন্ধে ধারণা করার প্রবণতা কাজ করে। যদি এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদের কাছে মনে হয়, মানুষটি

অপরিচিত এবং অবস্থাপন্ন পরিবারের, তখন আমরা তাকে 'আপনি' বা অন্তত:পক্ষে 'তুমি' বলে সম্বোধন করি, তা সে বয়োজ্যেষ্ঠই হোক বা কনিষ্ঠই হোক। কিন্তু যদি সে অপরিচিত মানুষটি যদি নিম্নবিত্ত পরিবারের বলে প্রতীয়মান হয়, সে নিয়ম মানা হয় না। আমি যখন বাইরে বের হই, উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বাসে বা টেম্পোতে যাতায়াতের সময় বাসের হেলপার কিশোরদের সঙ্গে কিংবা ফুল কেনা বা পয়সা দিয়ে চা/পানি খাওয়ার সময় অবলীলায় 'তুই' বলে ডাকতে দ্বিধাহীনতা কাজ করে। আবার বাজার করার সময় ক্রেতাদের মধ্যে দ্ব্যর্থহীনভাবে দোকানী কিশোর বা তরুণদেরকে অনায়াসে তুই তোকারি করার মানসিকতা হরহামেশাই চোখে পড়ে, তা সে নিম্নবিত্ত দোকানী কিশোর বা তরুণ যত অপরিচিতই হোক না কেন। অবশ্য নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গেও আমরা অনেকসময় তুইতোকারি করে থাকি। যেমন : অনেক অবস্থাপন্ন পরিবারের যুবকদেরকে দেখি কোথাও রিকশাযোগে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত নিলে প্রাপ্তবয়স্ক রিকশাচালককে *'ঐ খালি, যাবি?'* (রিক্সাওয়ালাদের 'খালি' নামে ডাকতে কোন ভদ্রলোকেরই বাঁধে না!) ইত্যাদি ভাষায় কথা বলতে। আবার রেগে গেলে তারা অনেক সময় গালিগালাজ সহযোগে রিকশাচালকদের সঙ্গে 'তুই' 'তুই' করে থাকে। অনেকে হয়তো বলবেন, কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের 'তুই' বলার মধ্যে দোষের কিছু নেই। যারা এ কথা বলেন, তারা কখনো অপরিচিত অবস্থাপন্ন ঘরের কিশোর বা তরুণদের 'তুই' বলে কথোপকথন করেন না। কারণ, তা সমাজে অভদ্রজনিত এবং অশোভন আচরণের পর্যায়ে পড়ে এবং তা নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন ঘরের কিশোর বা তরুণদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করবে। তা হলে নিম্নআয়ের কিশোর বা তরুণদের 'তুই' বলার হেতু কি? এর কারণটা যে কেবলমাত্র তাদের পেশার প্রতি অবজ্ঞাপ্রসুত, তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এই হলো আমাদের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ! অথচ আমরা ভুলে যাই, এ সমস্ত নিম্ন আয়ের মানুষজন ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রায় অচল হয়ে যেত। এরা যে আমাদের দেশের গুরুত্বপুর্ণ সম্পদ, এ বোধ আমাদের থেকেও নেই।

আমার এক জনৈক আত্মীয়কে এ ব্যপারে প্রশ্ন করা হলে সে যা জবাব দেয়, তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি জবাব দিয়েছেন এভাবে:

> *"ধরো, তুমি কোন জলবিক্রেতাকে ডেকে বললে,'এই পানিওয়ালা, এদিকে আসেন।' তাহলে সে তোমার কাছ থেকে এক গাস জলের দাম দশ টাকা চেয়ে বসবে।"*

কি চমৎকার উত্তর! ঐ আত্মীয় যেন সব জলবিক্রেতাকেই পর্যবেক্ষণ করেছে। যদি ধরেও নেই, তার কথা সত্য, তাহলে বলব, সব পেশাতেই অল্প কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের ভালো ব্যবহার বা উদারতার সুযোগ নেয়। কিন্তু তাই বলে ঐ পেশার সমস্ত লোকদের সঙ্গে তুই তোকারি করে তাদের পেশাকে অপমান করা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

আর এক আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করেছি,"আপনারা যে সমস্ত ফুলবিক্রেতা বা জলবিক্রেতাকে 'তুই' 'তুই' করে কথা বলেন, তাদের তো আপনি চেনেনই না। অথচ পরীক্ষার হলে ঠিকই তো শ্রমের মর্যাদা রচনায় সুন্দর সুন্দর কথা লেখেন।" তিনি এর যে জবাব দিয়েছেন তা আরও মজার। তিনি বললেন,"আমাকে তো পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম,"এত রচনা থাকতে ঐ রচনাটাই বা আপনি লেখেন কেন?" তার উত্তরে তিনি বললেন,"আমি তো একটি রচনাই জানি, আমি এ রচনা না লিখলে কিভাবে পাশ করব, সার্টিফিকেট আসবে কি ভাবে?" তার কথায় পরিষ্কার বোঝা গেল, পরীক্ষায় পাশ তথা সার্টিফিকেট পাওয়াটাই তার কাছে

মুখ্য, বাস্তব জীবনে শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাস করাটা তার কাছে গুরুত্বপুর্ণ নয়। আলু-পটল বিক্রেতা যেমন আলু-পটল বিক্রি করে খায়, তিনিও শুধুমাত্র সার্টিফিকেট তথা চাকরির জন্যই মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে শ্রমের মর্যাদা রচনা লেখেন, এর চেয়ে বেশি তিনি কিছু নন। এই হলো আমাদের দেশে শ্রমের মর্যাদার বাস্তব চিত্র।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই, যারা পরীক্ষার হলে 'শ্রমের মর্যাদা' রচনা লিখেছেন, তাদের খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা কেবলমাত্র তখনই সার্থক হবে, যদি আমরা বাস্তব জীবনে শ্রমের মর্যাদায় মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আর শ্রমের মর্যাদায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হতে হলে অপরিচিত ব্যক্তি, যে বয়সেরই হোক, যে পেশায়ই নিয়োজিত হোক, তাদের সঙ্গে 'আপনি', অন্তত:পক্ষে 'তুমি' সম্বোধন করে ন্যুনতম সন্মানটুকু দেওয়া উচিত। তুইতোকারি করে কারো পেশাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার অধিকার আমাদের নেই। কারণ একটি দেশের উন্নতি সব পেশার মানুষেরই প্রয়োজন আছে। যেখানে সারা বিশ্ব এগিয়ে চলছে, সেখানে এখনো যদি আমরা পেশাগত কারণে কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি, তবে আমরা কোনদিন এগুতে পারব না। তাই দেশের উন্নতির স্বার্থে শ্রমের মর্যাদা শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য লিখিত রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, কার্যক্ষেত্রেও এর বাস্তব প্রতিফলন একান্ত অপরিহার্য।

বিনীত
অনুজিৎ রায়,
বি.এস.সি. অনার্স (গণিত বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),

(নিবন্ধটি **দৈনিক সংবাদে** প্রকাশিত এবং মুক্ত-মনা ওয়েব-সাইটের জন্য প্রেরিত)